৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১২

Topic:
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

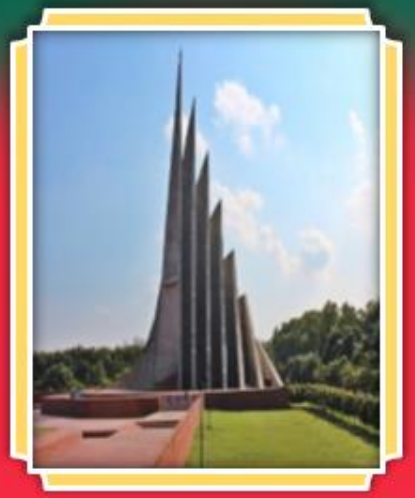
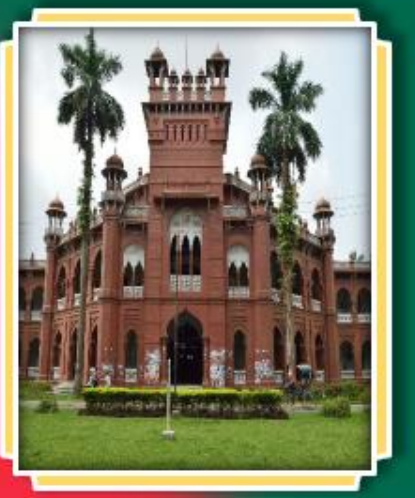
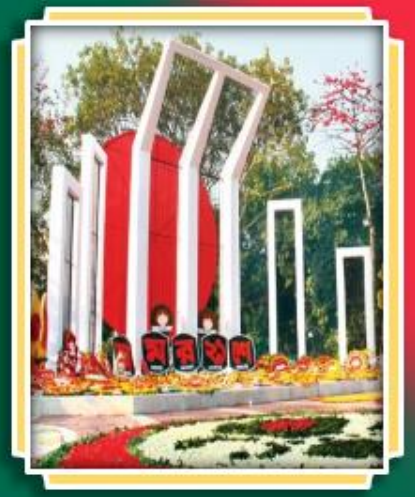
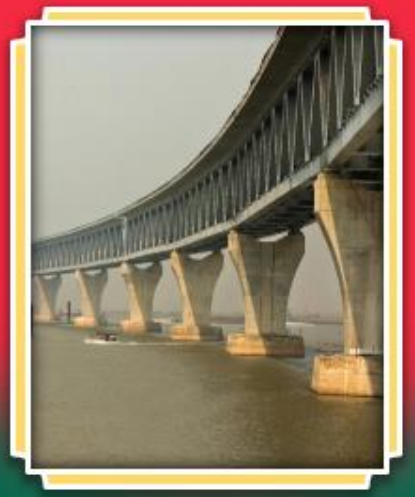
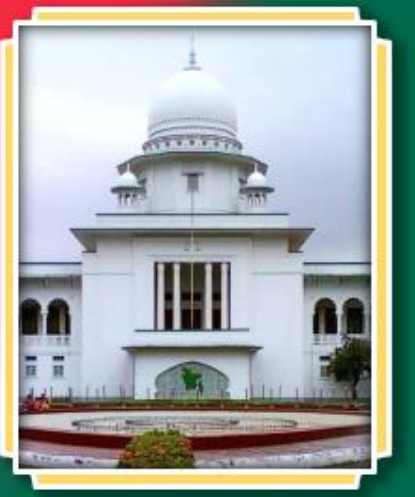

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

আলোচ্য বিষয়

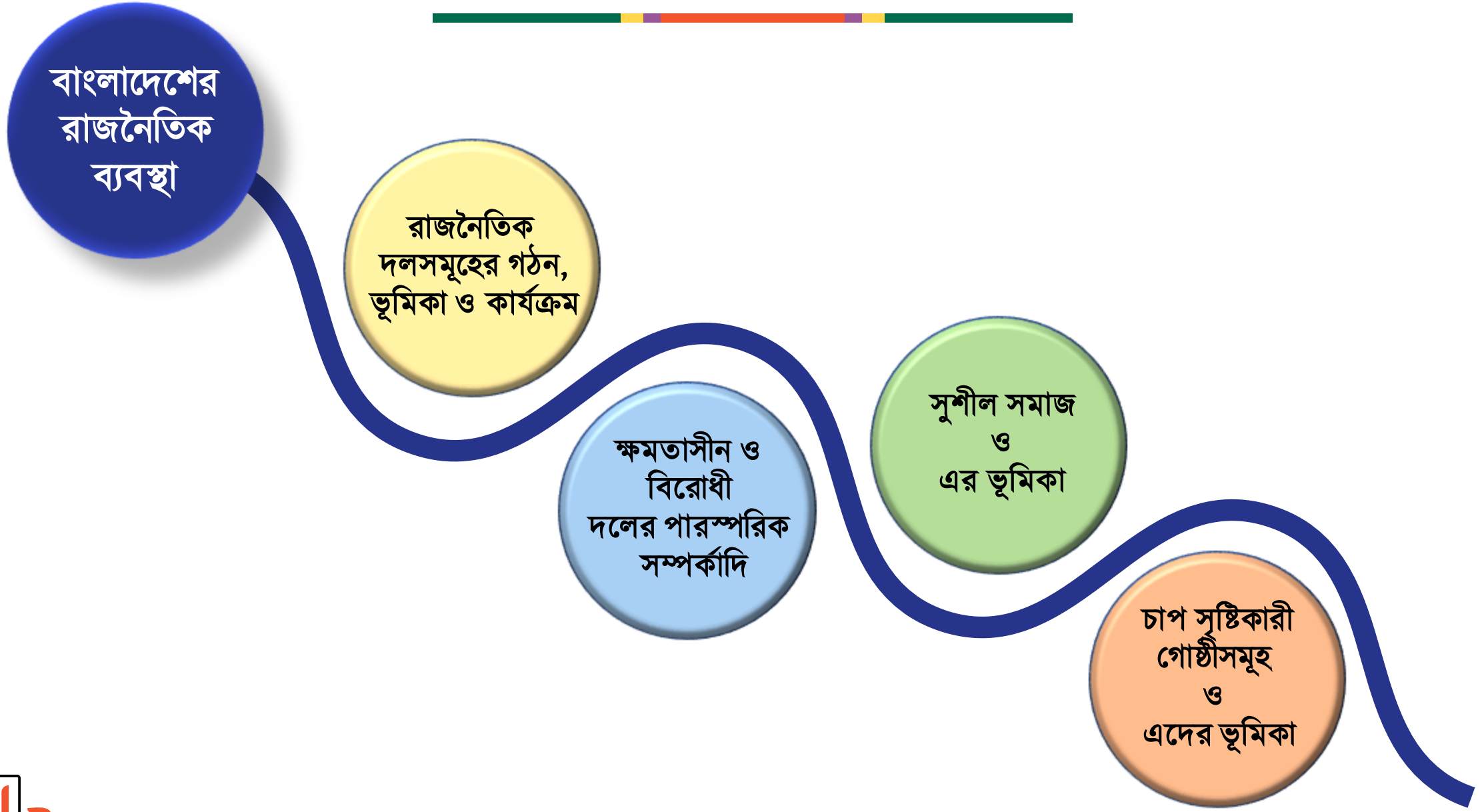
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম
ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি
সুশীল সমাজ ও এর ভূমিকা
চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ ও এদের ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ। আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতকে তাই Voice of God বলা হয়। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে তাই "দলীয় সরকার" বলা হয়। রাজনৈতিক দল হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ। রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

অধ্যাপক গেটেল (Gettel)-এর মতে, "রাজনৈতিক দল মোটামুটিভাবে সংগঠিত এমন একটি নাগরিক সম্প্রদায়, যারা একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে এবং যারা তাদের ভোটদান ক্ষমতার দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ নীতিগুলোকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে।

ডিজরেলি (Disraeli)-এর মতে, "কতগুলো নীতি অনুসরণের জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে দল বলা হয়।" (A party is a group of men banded together to pursue certain principles.)

মরিস দ্যুভারজার-এর মতে, "রাজনৈতিক দল হলো এমন একটি সংঘ যার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে।" (A party is a community with a particular structure.)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

অধ্যাপক ম্যাকাইভার-এর মতে, "রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনা নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়" (Political Party is an association organised in support of some Principle or Policy which by constitutional means it endeavours to make the determinant of government.)

সুতরাং, রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্র পরিচালনারনীতি সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

- রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।
- প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। আদর্শের দিক থেকে কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ হয়।
- অন্যদিকে অর্থনীতির রূপরেখা বিবেচনায়ও দল ভিন্ন হতে পারে। যেমন - সমাজতান্ত্রিক দল ও পুঁজিবাদী দল।

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম:

- রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হচ্ছে সরকার গঠন করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, সেই দলই সরকার গঠন করে।
- রাজনৈতিক দলের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে তার আদর্শ ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন করা। এই জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা, মিছিল ও গণযোগাযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করে।
- জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করাও রাজনৈতিক দলের কাজ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

দলীয় ব্যবস্থার বিভিন্নরূপ

রাজনৈতিক দলের সংখ্যার ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা –

(ক) একদলীয় ব্যবস্থা (One- Party System),
(খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System) এবং
(গ) বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System)

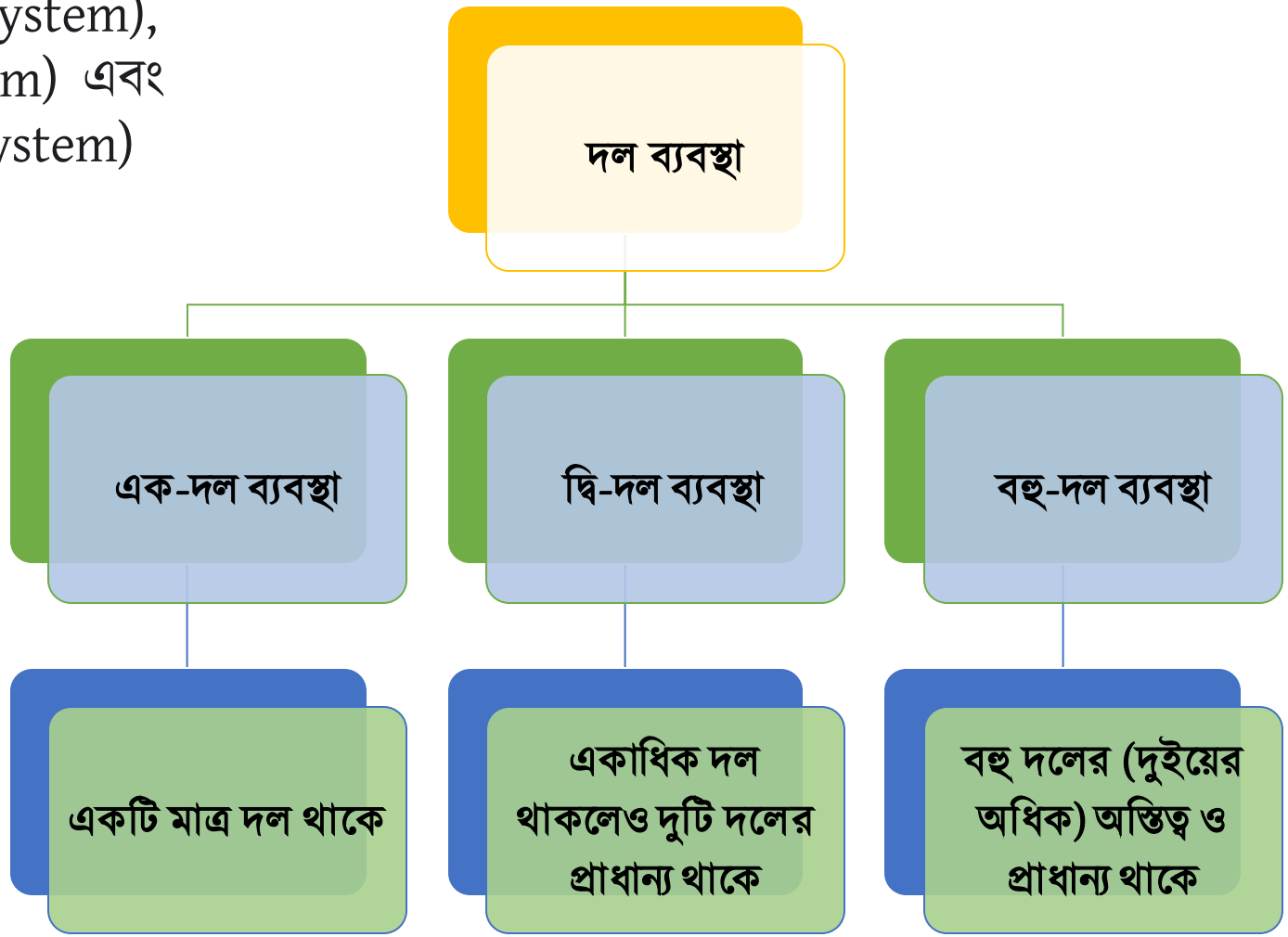

ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার রয়েছে। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সংসদ সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তবে সংসদকে অর্থবহ ও কার্যকর করতে হলে প্রয়োজন সৎ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সংসদ সদস্য এবং দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী বিরোধী দল। সংসদকে কার্যকর করার দায়িত্ব সরকার ও বিরোধী দলের। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে বলা হয় বিকল্প সরকার। বিরোধী দলের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য মন্ত্রিসভার সদস্য। উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী দল সরকারি দলের ন্যায় যে মন্ত্রিসভা গঠন করে, তাকে বলা হয় ছায়া মন্ত্রিসভা। বর্তমানে সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ (জাতীয় পার্টি)।

জনগণের স্বার্থবিরোধী সরকারকে অপসারণ করে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো জনস্বার্থবিরোধী সামরিক সরকারকে হটিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯১ সালে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতের মাধ্যমে আবারও সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সংসদ নির্বাচন ছিলো একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যা ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯ শুরু হওয়া অধিবেশনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে একাদশ জাতীয় সংসদ।

ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

আরো কিছু তথ্য

- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয়- বিরোধী দলকে।
- উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী দলও সরকারি দলের ন্যায় গঠন করে ছায়া মন্ত্রিসভা।
- বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অপর নাম হলো দলীয় শাসন।
- বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সম্পর্ক দা-কুমড়ার ন্যায়।
- জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা কার্যত- দুর্বল।
- রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার।
- বিরোধী দলকে রাজা ও রাণীর বিরোধী দল বলা হয়- ইংল্যান্ডে।
- সরকারি দলের অন্যতম ত্রুটি হলো- সমালোচনা সহ্য না করতে পারা।
- বিরোধী দলের একটি দোষ হলো বিরোধিতার জন্য কেবল বিরোধিতা করা।
- দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া উচিত- ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল উভয়েরই।
- If there is no opposition, there is no democracy উক্তিটি করেছিলেন Ivor Jennings।

POLL QUESTION-01

✪ **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি কি?**

(a) রাজনৈতিক দল

(b) আমলাতন্ত্র

(c) ছাত্র সংগঠন

(d) জাতীয় সংসদ

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন।

আলফ্রেড গ্রাজিয়ার (Alfred Grazier)-এর মতে, "চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।"

এ্যালান আর. বল (Allan R. Ball) বলেন, "সমমনোভাবাপন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বোঝায়" (A Pressure group can be defined as a group whose members hold shared attitude.)

G.A. Almond এবং Powell চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সাধারণত চার (৪) ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

ক. স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী

খ. সংগঠন ভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী

গ. সংগঠনহীন স্বার্থগোষ্ঠী

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে এস.ই. ফাইবার 'লবি গ্রুপ' এবং এইচ. জিগলার 'Interest group' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ তাদের পছন্দের দল বা ব্যক্তিকে অর্থ দিয়ে, যানবাহন দিয়ে প্রচার কাজে সাহায্য করে। তাদের পছন্দনীয় দল বা ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে আইনপ্রণয়ন ও শাসন কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। প্রয়োজনবোধে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মিটিং, মিছিল, শোভাযাত্রার সাহায্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার করা।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ:

- CPD- Centre for Policy Dialogue
- TIB- Transparency International Bangladesh
- BLAST-Bangladesh Legal Aid & Service Trust
- BEA- Bangladesh Economic Association
- CBA- Collective Bargaining Agent
- BELA- Bangladesh Environmental Lawyers Association
- সুজন- সুশাসনের জন্য নাগরিক
- আসক- আইন ও সালিশ কেন্দ্র
- ডেমোক্রেসি ওয়াচ
- সনাক - সচেতন নাগরিক কমিটি
- বাংলাদেশ মহিলা সমিতি

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

- তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ- বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি
- বিশ্বব্যাংক
- আইএমএফ ইত্যাদি

এগুলো ছাড়াও পুঁজিপতি, শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী উন্নত বিশ্বে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।

রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য:

রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১. **জাতীয় কল্যাণ:** রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না।

২. **সাংগঠনিক পার্থক্য:** সাংগঠনিক দিক থেকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল।

৩. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য:** রাজনৈতিকদলের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হলো সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করা।

৪. **কাজকর্মের পদ্ধতি:** রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য।

৫. **নির্বাচনে অংশগ্রহণ:** রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে না।

৬. **প্রকৃতিগত পার্থক্য:** রাজনৈতিক দল গঠিত হয় বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও পেশার লোকজন নিয়ে। কিন্তু চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সমস্বার্থ ও সমমনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের স্বার্থগত ইস্যুগুলোতে একই রকম মনোভাব পোষণ করে। এই গোষ্ঠী নানাবিধ চাপ প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য:

১। দলীয় সংগঠনবিহীন

২। দলীয় কর্মসূচিবিহীন

৩। নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়া

৪। সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করা

৫। সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নয়

৬। সমজাতীয় মনোভাব

৭। বেসরকারি সংগঠন

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সরাসরি না থাকলেও, মূলত রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই তারা দাবি বা স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এভাবে দেখলে রাজনৈতিক দল না হলেও, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

আরো কিছু তথ্য

- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের যেসব ঘটনাপ্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে- রাজনৈতিক।
- যে সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ- উদারনৈতিক গণতন্ত্রে।
- উদ্দেশ্য অনুসারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে ভাগ করা হয় দুই ভাগে।
- শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট যে ধরনের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী- সংরক্ষণমূলক।
- কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করে এমন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বলা হয় উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। তারা উন্নয়নের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে ওয়াচডগ হিসেবে।
- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ হলো একধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যে ধরনের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত - বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ।
- সুশীল সমাজ কাজ করে - চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হলো - গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার।
- সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চায় - চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে - চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- শাসনবিভাগকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ সাহায্য করে তথ্য দিয়ে।
- উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে অনেক সময় আখ্যায়িত করা হয় সুশীল সমাজ ও এনজিও নামে।
- Almond ও Powel চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন- ৪ ভাগে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে চাপ দেয় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো উদ্দেশ্যগত ভিন্নতা।

POLL QUESTION-02

✪ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের কোন ঘটনাপ্রবাহের উপর প্রভাব ফেলে?

(a) সামাজিক

(b) ধর্মীয়

(c) অর্থনৈতিক

(d) সাংস্কৃতিক

সুশীল সমাজ

সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে তারাই সুশীল সমাজ। জনগণের যে অংশ সরাসরি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় কিংবা এসব থেকে সরাসরি সুবিধা লাভ করে না সে অংশকে সুশীল সমাজ বলে। সুশীল সমাজ হল রাষ্ট্রের প্রধান চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। নাগরিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও, ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সেচ্ছাসেবী সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন, গণমাধ্যম, বিশেষ স্বার্থদল ইত্যাদি সুশীল সমাজের উদাহরণ। রাষ্ট্রকে কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, সরকারকে দিক নির্দেশনা দেওয়া, সমাজে আইন, শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি সুশীল সমাজের কাজ। মূলত রাষ্ট্রের শাসন বিভাগকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করাই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ।

সিভিল সোসাইটির ধারণা অনেক দিনের। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সিভিল সোসাইটির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। জনসাধারণকেই স্বাভাবিক অর্থে সিভিল সোসাইটি বলা হয়। তবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের দ্বারা গঠিত যেকোনো বেসরকারি সংগঠনই সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত। সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতারই স্বরূপ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক চিন্তনে সিভিল সোসাইটি কমনওয়েলথ এবং রাজনৈতিক সমাজের সমান্তরাল ছিল। সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিরোধিতা ছিল না। সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটি সমাজের 'তৃতীয় বিভাগ' হিসাবে গণ্য হয়, যা সরকার এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা। সুশীল সমাজ মূলত সমাজের কোনো ব্যক্তি কিংবা সংগঠন বা বেসরকারি সংস্থার সমষ্টি হিসাবে বোঝানো হয়। যা নাগরিকদের স্বার্থের ব্যাপারে আগ্রহী হয় এবং সরকার নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজ (Civil Society) : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল সোসাইটির ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য দেন দার্শনিক হেগেল। তিনি মনে করতেন আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার এত শক্তিশালী হয়ে পড়েছে যে এখানে ব্যক্তির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাই ব্যক্তিরা নিজ উদ্যোগে পরিবার ও রাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। হেগেল মনে করতেন, সিভিল সোসাইটি যেমন রাষ্ট্রের নজরদারি করে, রাষ্ট্রেরও উচিত তেমনিভাবে সিভিল সোসাইটির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। তাই হেগেল সিভিল সোসাইটিকে বুর্জোয়া সমাজের সাথে একাত্ম করেছেন। যদিও তাঁর সিভিল সোসাইটির ভিত্তি শুধু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, তবু আধুনিক অর্থনীতি এই সমাজের অন্তরায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের সর্বজনীনতা সংরক্ষণ। দুইয়ের বিভক্তি একটি নতুন শ্রেণি। নতুন সামাজিক অস্তিত্বের পরিসর একটি স্বতন্ত্র, স্বশাসিত অর্থনীতি।

কার্ল মার্কস সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্রের প্রত্যয়গত ভিন্নতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রের সর্বজনীনতা অস্বীকার করেছেন এবং সিভিল সোসাইটি ও তার শ্রেণিসম্পর্কের বৈশিষ্ট্যে যে রাষ্ট্র প্রকাশ করে, সেদিকে জোর দিয়েছেন।

সুশীল সমাজ

গ্রামীণ সিভিল সোসাইটির প্রত্যয় প্রণীত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে। তার মতে, সিভিল সোসাইটি হচ্ছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কেবল ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিরুদ্ধে নয়, প্রাত্যহিক জীবনে প্রোথিত ধনতন্ত্রের সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শিক শিকড়ের বিরুদ্ধে।

সিভিল সোসাইটির ধারণা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি ধারণা হিসেবে গড়ে ওঠেছে।

- ❑ সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ;
- ❑ রাষ্ট্র নাগরিকের ওপর কর্তৃত্ব চালায়;
- ❑ রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে।

সুশীল সমাজ

নাগরিক রাষ্ট্রের দাস নয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সীমানাকে সংগঠিত করতেই সিভিল সোসাইটির ধারণা উদ্ভূত হয়েছে। নাগরিক স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও জীবনযাপনের মাধ্যমে জীবনকাল অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্র নাগরিককে তার প্রত্যাশিত স্বাধীনতা দিতে চায় না। ফলে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ পেতে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে যুক্তিযুক্তভাবে ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করে, তখন সিভিল সোসাইটির উদ্ভব ঘটে বলে ধরে নেওয়া হয়। এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- ❑ নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা;
- ❑ গণতান্ত্রিক অধিকার;
- ❑ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যৌক্তিকভাবে শাণিত করা।

সিভিল সোসাইটির কার্যাবলি :

১. সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা
২. মানবাধিকার রক্ষা
৩. জনসচেতনতা তৈরি করা
৪. ক্ষমতাকে প্রতিহত করা
৫. দুর্নীতি প্রতিহত করা
৬. ব্যক্তির স্বাধীনতা

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

রাষ্ট্র সব সময় ব্যক্তিকে গ্রাস করতে চায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন না করা গেলে রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অনিবার্যভাবেই ক্ষুণ্ন করে থাকে। এ প্রসঙ্গ থেকেই সিভিল সোসাইটির ধারণাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সিভিল সোসাইটি শক্তিশালী হলে দুটি বিষয়ে সুফল পাওয়া যায়-

- ❑ ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ করা;
- ❑ রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রয়োগের চৌহদ্দি সম্বন্ধে সচেতন হবে।

মূলত রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির মধ্যকার সম্পর্ক বিপরীতমুখী এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল।

ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে স্বাধীন ও সুস্থ রাখতে হবে, যাতে সে তার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। এই সমসাময়িক ধারণা সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নমুনায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো সমাজ গঠন। এই সমাজ গঠনকে শক্তিশালী হতে হবে। যুক্তিশীল কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। যুক্তিশীল কাঠামো নষ্ট হলে স্বৈরতন্ত্র, আইন অমান্য, সামাজিক নিপীড়ন, সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্ট হবে, যা নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে মানুষকে যুক্তিক আইন মান্য করে চলতে হবে। আধুনিক সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে সমাজে অব্যবস্থাও বেড়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিমূল সমাজ ব্যবস্থার এ নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর জন্য মানুষকে তার নিজ স্বার্থেই যুক্তি ও সহনশীলতার নির্দেশ মানতে হবে। এ প্রক্রিয়া সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করে রাষ্ট্রক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পরিসরে বিভিন্ন রূপে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়; যেমন-

- ❑ সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব;
- ❑ এক পেশার সাথে অন্য পেশার ভিন্নতা;
- ❑ এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের ভিন্নতা। এ ভিন্নতা কখনও ক্ষমতার ভিন্নতা, গ্রাম অপেক্ষা শহর অধিক শক্তিশালী;
- ❑ শুধু ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ্বই নয়, নারী-পুরষ লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্বও হতে পারে;
- ❑ এক স্বার্থের সাথে অন্য স্বার্থের ভিন্নতা।

রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার তার দলীয় শক্তি বৃদ্ধি ও প্রতিপক্ষহীন করার লক্ষ্যে এ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে শুধু নিজস্ব স্বার্থই নয়, সিভিল সোসাইটির চ্যালেঞ্জ, যা রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্ববাদ মনোভাবের বিরুদ্ধে।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ একটি প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা দূর করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবা হয়। ক্ষমতার স্বরূপ বুঝতে হলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের স্বরূপ বুঝতে হবে।

সরকারি কর্মচারি ও জনগণ: সরকারি কর্মচারীরা মূলত জনগণের সেবক ও অধীন। অথচ জনগণই সরকারি কর্মচারীদের অধীন হচ্ছে।

সরকারি দল ও বিরোধী দল: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি দল অন্যান্য বিরোধী দলের চিন্তাচেতনার মূল্যায়ন করবে। অথচ সরকারি দল বিরোধী দলকে মূল্যই দেয় না।

POLL QUESTION-03

✪ সুজন কে/কি?

(a) একজন বিখ্যাত সাংবাদিক

(b) একটি রাজনৈতিক দল

(c) একটি চাপ সৃষ্টিকারি গোষ্ঠী

(d) একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

জনগণ ও আইনসভা: আইনসভা জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়। জনগণের স্বার্থ রক্ষা হবে এটাই কাম্য। কিন্তু আইনসভা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করছে। এতে জনগণ অসন্তুষ্ট হচ্ছে। এভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সবাই সরে যাচ্ছে। এ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। সিভিল সোসাইটির ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতায় গিয়ে সিভিল সোসাইটিকে রুষ্ট করার এ তৎপরতা কল্যাণকর নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে সিভিল সোসাইটিকে রুষ্ট করার প্রবণতা বিদ্যমান। অথচ ক্ষমতার ভিত্তি রচিত হয় সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-চেতনা সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে। যুক্ত হচ্ছে ক্ষমতার কর্তৃত্ববাদী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিভিল সোসাইটির ভিত্তিমূলে রয়েছে প্রত্যয়গত দিক থেকে রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির মধ্যকার বিরোধিতা।

সিভিল সোসাইটির ধারণা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে: মানুষকে বাঁচতে হলে দরকার স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ। এ কারণেই সিভিল সোসাইটির তত্ত্বটি উত্থাপিত হয়েছে। তাত্ত্বিকরা এ কারণেই নৈতিক দিকটা উত্থাপন করেন। ক্ষমতা ও নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা একারণে বিবেচিত হয়: যে ক্ষমতার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক নেই তা জনসাধারণের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর নয়। ক্ষমতা দিয়ে যদি শুধু ধ্বংস ও নৈতিকতাবিরোধী কাজ হয়, তবে সেটা কাম্য নয়। ক্ষমতাকে ক্ষমতা হিসেবে বোঝাতে চেষ্টা করলে নৈতিকতার প্রশ্ন আসে। বর্তমানে ক্ষমতা মানুষের অমঙ্গলের জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের পথই তাত্ত্বিকরা খুঁজছেন সিভিল সোসাইটি তত্ত্বের মাধ্যমে। ক্ষমতার এ অপ্রপ্রয়োগ বন্ধের পন্থা হিসেবে সিভিল সোসাইটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলেই সিভিল সোসাইটির ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

জনগণকে ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে আসা: সিভিল সোসাইটি তত্ত্বের বহুল প্রচলনের আরেকটি কারণ হলো এ তত্ত্বে বলা হয়েছে, কিভাবে সাধারণ জনগণকে ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে আসা যায়। বিশ্বপরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি ঘোরালে দেখা যায় যে নব্বইয়ের দশক থেকে জনগণ ক্ষমতার কেন্দ্রে আসার চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অংশ নিচ্ছে। ফলে যুদ্ধ অবান্তর হয়ে পড়ছে। সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তুলে সেনাবাহিনীর অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই যুদ্ধের- এটাই সিভিল সোসাইটির তাত্ত্বিকদের বর্তমান মতবাদ। এ মতবাদ বিতর্কিত হলেও বহুল প্রচলিত।

আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটির ভূমিকা: সিভিল সোসাইটির ধারণার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটির ভূমিকা। যেকোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ, মানবতাবিরোধী কাজে আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটি প্রশ্ন তুলেছে। নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে সমস্যাকে চাপা দেওয়ার সুযোগ দিতে সিভিল সোসাইটি রাজি নয়। সিভিল সোসাইটি জনগণের পক্ষে ভূমিকা পালন করছে জনগণের মঙ্গলার্থে। জনগণ আজ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে। সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব জনগণকে এ থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে স্বাধীন ও সুস্থ জীবনের আশাবাদ জোগাচ্ছে। এ কারণেই সিভিল সোসাইটির ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

বাংলাদেশ ও সিভিল সোসাইটি: বাংলাদেশে সমাজ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘকালীন ধারণা রয়েছে। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে সামাজিক ক্ষমতাকে প্রধান মনে করা হতো। এ ক্ষমতার স্থান ও পরিসর স্বশাসিত। এ স্বশাসিত ক্ষমতার ভিত্তি ছিল সম্পত্তি। ব্যক্তিক সম্পত্তির সাথে ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ, যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক লেনদেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশ আরোপ ও ব্রিটিশ সৃষ্ট প্রশাসনের দরুন বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির ধারণা বদলে যায়। এ সামাজিক ক্ষমতার স্থলে আসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা; এবং ব্যক্তির সম্পত্তির ধারণা রাষ্ট্র আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। এ পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য স্বত্ত সিভিল সোসাইটির ধারণা নির্মাণ করা হয়। যেমন-

- ❑ দুদু মিয়া ও ফরায়েজীর মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসাভিত্তিক সমাজশক্তির উদ্ভাবন;
- ❑ গান্ধীবাদী সমাজশক্তির রামরাজ্য স্থাপন;
- ❑ রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক মনোভঙ্গি উদ্ভূত শান্তিনিকেতন এবং গ্রামীণ পুনর্গঠন হিসেবে শ্রীনিকেতন;
- ❑ খ্রিষ্টান মিশনারির দৃষ্টিভঙ্গি;
- ❑ মওলানা ভাসানী, দুদু মিয়া, গান্ধী ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের মনোভূষণের মিশ্রণ;
- ❑ স্বদেশি ব্যাংক, বিমা ও স্কুল নির্মাণের আবহাওয়া;

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

উপরিউক্ত বোধসমূহের মধ্যে দুটো সাধারণ বাধা বিদ্যমান ছিল:

- ❑ রাষ্ট্রের বিকল্প বা সমান্তরাল সমাজশক্তির উদ্বোধন;
- ❑ রাষ্ট্র হচ্ছে ঔপনিবেশিক/বিজাতীয় শক্তি, রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তি সত্তার কলুষকারক এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজশক্তির আত্মশক্তির বিরোধী।

এ সাধারণ বোধ, যা সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে বিদ্যমান ছিল ঔপনিবেশিক আমলে, তার মূলত কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হচ্ছে জবরদস্তি, সে ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটি হচ্ছে স্বাধীনতা। এ বোধ রাষ্ট্রক্ষেত্রে যত সত্য, সিভিল সোসাইটিতে তত সত্য নয়। কারণ বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির অকার্যকর উপস্থিতি অনুপস্থিতির নামান্তর।

সিভিল সোসাইটি- মুজিব থেকে এরশাদ পর্ব: সিভিল সোসাইটি শেখ মুজিব থেকে এরশাদ পর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মাত্রায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে নিমজ্জিত এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে স্বৈরশাসন, সামরিক শাসন, বেসামরিক শাসনের ছদ্মবেশে সামরিক শাসন, বহুদলীয় শাসনের ছদ্মবেশে একদলীয় কর্তৃত্ব বিভিন্ন মাত্রায় সিভিল শাসনের স্বশাসন হরণ করেছে এবং এ শাসন রাষ্ট্রীয় শাসনের অঙ্গীভূত করেছে।

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির পার্থক্য: বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির মধ্যকার পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। রাষ্ট্র সিভিল সোসাইটির জায়গা অনবরত গ্রাস করেছে। এ অস্বীকৃতি ও গ্রাসের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্র খর্ব করেছে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার বোধ গ্রাস করেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির দ্বন্দ্বের জন্য রাষ্ট্রের নির্যাতনের শঙ্কা জনমনে ঘনীভূত হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকর্মের একটি সীমা তৈরির বোধ প্রকাশ লাভ করেছে এবং সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চাপ নির্মাণের প্রয়াস দেখা দিয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, বিশেষ করে এই ক্ষমতাকে সমাজের মধ্যে সভা-সমিতি এবং স্বশাসিত সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নটি জরুরি হয়ে পড়েছে।

সিভিল সোসাইটির ভিত্তি: সামরিক-বেসামরিক, স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘকালীন শর্ত হওয়ার দরুন সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল ভিন্নতা এবং বিভিন্নতাই সিভিল সোসাইটির ভিত্তি, বহুত্ববাদের কেন্দ্র ও মূল।

রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

মতাদর্শিক বিরোধিতা: মুজিবের বাকশাল, জিয়াউর রহমানের সামরিক আমল কিংবা বহুদলীয় শাসন প্রবর্তনের ছদ্মবেশে সামরিক কর্তৃত্ব কিংবা এরশাদের সামরিক আমল কিংবা রাজনৈতিক শাসন প্রবর্তনের ছদ্মবেশে সামরিক উপস্থিতি-সব ক্ষেত্রেই সিভিল সোসাইটি থেকে উৎসারিত হয়েছে রাষ্ট্রের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মতাদর্শিক বিরোধিতার শক্তিসমূহ। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের মাধ্যমসমূহ ক্রমাগত সমাজের মুক্তক্ষেত্র দখল করে। এজন্য সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্রের বিরোধিতার সম্পর্ক থেকে রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী, রাজনৈতিক সামরিক কর্তৃত্ব বিভাজিত হয়েছে।

জনমত গঠনে সুশীল সমাজের ভূমিকা

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে জনমত বলা হয়। অর্থাৎ যেকোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা যেতে পারে। জনমত হচ্ছে কল্যাণধর্মী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক ও সুস্পষ্ট মতামত যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। জনগণের কল্যাণস্বার্থে সিভিল সোসাইটি জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. সিভিল সোসাইটি পত্র-পত্রিকা, সভা-সমাবেশ, চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। এতে করে জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলশ্রুতিতে এক ধরনের জনমত তৈরি হয়।

২. সিভিল সোসাইটি সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। দেশের নাগরিকদের চাহিদা, প্রয়োজন এবং দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরে সুশীল সমাজ। সেই সাথে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা তৈরি হয় এবং জনমত গড়ে উঠে।

৩. সিভিল সোসাইটি মানবাধিকার রক্ষার কাজটি করে থাকে। দেশের কোথাও কোনো ধরনের মানবাধিকারের লঙ্ঘন হলে সিভিল সোসাইটি তা তুলে ধরে এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। এতে করে মানবাধিকারের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের জনমত গড়ে উঠে যা সরকারকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।

জনমত গঠনে সুশীল সমাজের ভূমিকা

৪. সিভিল সোসাইটির অন্যতম কাজ হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা। ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে স্বাধীন ও সুস্থ রাখার চেষ্টা করে সিভিল সোসাইটি। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে সমাজে এক ধরনের জনমত গঠন করতে সাহায্য করে সিভিল সোসাইটি।

৫. দুর্নীতি সমাজ জীবনের একটি অভিশাপ। একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়। এ দুর্নীতি মোকাবিলায় জনমত গঠন করে সিভিল সোসাইটি। এতে করে সরকার দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।

৬. বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার নিশ্চিতকল্পে আইনের শাসনের বিকল্প নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার বা আইনের শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও সংগঠিত নয়। সুশীল সমাজ এ জায়গাটি পূরণ করে এবং বিভিন্ন রকমের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে যাতে তারা ন্যায়বিচার হতে কখনো বঞ্চিত না হয়।

জনমত গঠনে সুশীল সমাজের ভূমিকা

৭. একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার অনেক কম। শিক্ষার অভাবে মানুষের মধ্যে নাগরিক জ্ঞান একদম সীমিত। নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালাতে সুশীল সমাজের ভূমিকা অসামান্য। সুশীল সমাজের মাধ্যমেই শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয় যা জনমত গঠনে সাহায্য করে।

৮. কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বর্তমান বিশ্বে একটি মারাত্মক সমস্যা। কুসংস্কারের কারণে যেমন মানুষ পিছিয়ে পড়ে তেমনিভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামী সামাজিক শান্তি নষ্ট করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সুশীল সমাজ মানুষকে সহনশীল হতে শেখায় এবং জনমত গঠন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

৯. একটি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি আছে। সুশীল সমাজ এ মুহূর্তে নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন নিয়ে সভা-সমাবেশ বা সেমিনার এর আয়োজন করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই জনমত ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, সুশাসন সর্বোপরি গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

POLL QUESTION-04

✪ **সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করে-**

(a) রাজনৈতিক দল

(b) সুশীল সমাজ

(c) বিচার বিভাগ

(d) প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ

বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল:

- ২০০৮ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে। এর প্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের পর ৩টি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
- বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ৪৪টি।
- ১৪ নভেম্বর ২০১৮ হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের পরিপ্রেক্ষিত ৯ মে ২০১৯ সর্বশেষ নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন লাভ করে বাংলাদেশ কংগ্রেস। দলটির প্রতীক 'ডাব' এবং নিবন্ধন নং ৪৪।
- বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:

- প্রতীক: নৌকা
- প্রতিষ্ঠা: ২৩ জুন, ১৯৪৯
- প্রতিষ্ঠার স্থান: রোজ গার্ডেন, কেএম দাস লেন, স্বামীবাগ, ঢাকা
- প্রথম সভাপতি: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
- প্রথম সাধারণ সম্পাদক: শামসুল হক
- প্রথম যুগ্ম সম্পাদক: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
- পরিবর্তিত নাম: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (১৯৫৫ সালে)
- বর্তমান নাম: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
- সহযোগী সংগঠন: ১০টি
- বর্তমান সভানেত্রী: শেখ হাসিনা
- বর্তমান সাধারণ সম্পাদক: ওবায়দুল কাদের
- মূলনীতি: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি

- প্রতীকের নাম: ধানের শীষ
- প্রতিষ্ঠা: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
- প্রতিষ্ঠাতা: জিয়াউর রহমান
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)
- প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য: ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান তার সেনা শাসনকে বেসামরিক করার উদ্দেশ্যে ১৯ দফা কর্মসূচি শুরু করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় বিএনপি।
- চেয়ারপার্সন: বেগম খালেদা জিয়া
- ভাইস চেয়ারম্যান: তারেক রহমান
- লক্ষ্য: বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা এবং শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ

জাতীয় পার্টি

- প্রতীকের নাম: লাঙ্গল
- প্রতিষ্ঠা: ১ জানুয়ারি, ১৯৮৬
- প্রতিষ্ঠাতা: হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
- বর্তমান চেয়ারম্যান: জি এম কাদের
- মহাসচিব: জিয়া উদ্দীন আহমেদ বাবলু

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

- প্রতীকের নাম: মশাল
- প্রতিষ্ঠা: ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২
- প্রতিষ্ঠাতা: এম এ জলিল ও আ.স.ম. আবদুর রব
- সভাপতি: হাসানুল হক ইনু, এম.পি
- সাধারণ সম্পাদক: শিরীন আখতার, এম.পি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

- প্রতীকের নাম: কাস্তে
- প্রতিষ্ঠা: ৬ মার্চ, ১৯৪৮
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: কমরেড মনি সিং
- সভাপতি: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
- সাধারণ সম্পাদক: মোঃ শাহ আলম

অন্যান্য নিবন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলসমূহ

বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪৪টি।

রাজনৈতিক দল (নিবন্ধিত)	প্রতীক	নিবন্ধনের তারিখ
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী	৩ নভেম্বর, ২০০৮
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি – এলডিপি	ছাতা	২০ অক্টোবর, ২০০৮
জাতীয় পার্টি - জেপি	বাইসাইকেল	২০ অক্টোবর, ২০০৮
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা	৩ নভেম্বর, ২০০৮
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা	৩ নভেম্বর, ২০০৮
গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর	৩ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর	৩ নভেম্বর, ২০০৮
বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা	৩ নভেম্বর, ২০০৮
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ	মশাল	৩ নভেম্বর, ২০০৮

অন্যান্য নিবন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলসমূহ

রাজনৈতিক দল (নিবন্ধিত)	প্রতীক	নিবন্ধনের তারিখ
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জেএসডি	তারা	৯ নভেম্বর, ২০০৮
জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল	৯ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	মই	৯ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি - বিজেপি	গরুর গাড়ি	৯ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা	৯ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ	১৩ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন	১৩ নভেম্বর, ২০০৮
ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি(এনপিপি)	আম	১৩ নভেম্বর, ২০০৮
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেঁজুর গাছ	১৩ নভেম্বর, ২০০৮
গণফ্রন্ট	মাছ	১৩ নভেম্বর, ২০০৮

অন্যান্য নিবন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলসমূহ

রাজনৈতিক দল (নিবন্ধিত)	প্রতীক	নিবন্ধনের তারিখ
গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য	১৩ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	কাঁঠাল	১৬ নভেম্বর, ২০০৮
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার	১৬ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাত ঘড়ি	১৭ নভেম্বর, ২০০৮
ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার	১৭ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিক্সা	২০ নভেম্বর, ২০০৮
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাত পাখা	২০ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি	২০ নভেম্বর, ২০০৮
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা	হুক্কা	২০ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল	২০ নভেম্বর, ২০০৮

অন্যান্য নিবন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলসমূহ

রাজনৈতিক দল (নিবন্ধিত)	প্রতীক	নিবন্ধনের তারিখ
খেলাফত মজলিস	দেওয়াল ঘড়ি	২২ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	হাত (পাঞ্জা)	২ জুন, ২০১৩
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	ছড়ি	৮ অক্টোবর, ২০১৩
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	টেলিভিশন	১৮ নভেম্বর, ২০১৩
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	সিংহ	৩০ জানুয়ারি, ২০১৯
বাংলাদেশ কংগ্রেস	ডাব	৯ মে, ২০১৯
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)	বাঘ	১৩ নভেম্বর, ২০০৮
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী	১৩ নভেম্বর, ২০০৮

নিবন্ধন বাতিলকৃত রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী:

১৯৪১ সালের ২৫ আগস্ট মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ প্রভৃতি বাহিনী গড়ে তোলে। এরা পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে কাজ করে এবং এই দলের সদস্যরা হত্যা, ধর্ষন, লুটপাট, সংখ্যালঘু নির্যাতন, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে জোড়পূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা, ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকা সহ বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এসব অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রমাণিত হয়েছে এবং এসব অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর অনেক নেতাকর্মীকে মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে । স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ছিল। ১লা আগস্ট, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এই সংগঠনের নিবন্ধন অবৈধ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করে।

আরো ২টি নিবন্ধন বাতিলকৃত রাজনৈতিক দল

১) বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি (কুড়াল), নিবন্ধনের তারিখ - ৪ নভেম্বর ২০০৮; বাতিল- ২০০৯

২) ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন (চাবি) নিবন্ধনের তারিখ – ১৬ নভেম্বর ২০০৮; বাতিল- ৪ অক্টোবর, ২০১৮

আরো কিছু তথ্য

- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬।
- স্বাধীনতা অর্জনে যে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সর্বাধিক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
- ৬ দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ।
- মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের বিপক্ষে।
- গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র- পরমতসহিষ্ণুতা।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা - বহুদলীয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী - এক দলীয় শাসনব্যবস্থা।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভাব রয়েছে - গণতন্ত্র চর্চার।
- বামপন্থি দলগুলোর আদর্শ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা আর ডানপন্থি দলগুলো ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোই - ব্যক্তিনির্ভর।
- গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা আয়নার ন্যায়।

আরো কিছু তথ্য

- রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট
- বিরোধী দলগুলোর দায়িত্ব হলো সরকারকে সঠিক পথে রাখা।
- হরতাল, ধর্মঘট আহ্বান করে সাধারণত বিরোধী দলগুলো। এ দেশের হরতাল, ধর্মঘটের ধরন- ধ্বংসাত্মক।
- রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে - জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা।
- বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী প্রধানমন্ত্রী।
- স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে- ৩টি।
- প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণ সন্তুষ্ট নয়- রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে।
- ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান ও বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পতন হয় স্বৈরশাসক এরশাদের।
- ইসলামী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯০ সালে।

POLL QUESTION-05

✪ বাংলাদেশে সর্বশেষ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম কি?

(a) খেলাফত মজলিশ

(b) ইসলামী ঐক্যজোট

(c) গণফোরাম

(d) বাংলাদেশ কংগ্রেস

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন- [৪০তম বিসিএস]

(ক) ৩ ভাগে (খ) ৪ ভাগে (গ) ৫ ভাগে (ঘ) ৬ ভাগে

➲ সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে – [৩৮তম বিসিএস]

(ক) রাজনৈতিক দল (খ) সুশীল সমাজ (গ) বিচার বিভাগ (ঘ) প্রশাসন বিভাগ

➲ বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়- [৪১তম বিসিএস]

(ক) ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ (খ) ৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩ (গ) ৭ মার্চ, ১৯৭৩ (ঘ) ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩

➲ বাংলাদেশের কোন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে কবে পাস করা হয়? [২১তম বিসিএস]

(ক) ২১ জানুয়ারি ১৯৯১ (খ) ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ (গ) ২৭ মার্চ ১৯৯৬ (ঘ) ২৮ এপ্রিল ১৯৯৭

➲ বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [১৩তম বিসিএস]

(ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি (খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি (গ) ২ মার্চ (ঘ) ৪ মার্চ

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়